# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শুক্রবার ২৭ পৌষ ১৪২৪ ■ ৩৮ বর্ষ ■ ২৩৪ সংখ্যা


## যন্ত্রণার উৎসব

কৃষিপ্রধান দেশ ভারতে এখন কৃষক ও কৃষি উভয়ই সমস্যায়। পশ্চিমবঙ্গও এর ব্যতিক্রম নয়। বিশেষত আলুচাষিদের দুর্গতি এখন চরমে উঠেছে। একই পরিস্থিতি বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশেও। অথচ এই দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের দাবি, তাঁদের আমলে কৃষকরা ভালো আছেন। ফসলের ভালো দাম পাচ্ছেন। সরকার তাঁদের পাশে আছে। শীতের ঠান্ডা আবহে এই রাজ্যে এখন উৎসবের ধুম। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ, সর্বত্রই নানা উৎসব অনুষ্ঠানের ঢালাও আয়োজন। সরকারের উৎসাহ, দাক্ষিণ্য, পৃষ্ঠপোষকতায় চলছে রকমারি উৎসব ও মেলা। আমজনতার ঢল নেমেছে এইসব মেলা উৎসবে। যা দেখে খুশি রাজ্য সরকার, প্রশাসন। উন্নয়ন ও উৎসবকে একই সুরের তারে বেঁধে দিতে উদ্যোগী মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সরকার। উৎসব ভালো, উন্নয়ন আরও ভালো। কোনো রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন সেখানকার সরকার, আমজনতার সমৃদ্ধির সূচক। কিন্তু বাহ্যিক উন্নয়ন, উৎসবের আড়ালে যদি থাকে একরাশ বেদনা, দীর্ঘশ্বাস, তার উৎসসন্ধান করে প্রতিকারের প্রয়াস নেওয়াও সরকারের কর্তব্য। গতবছর সর্বোচ্চ আদালতে পেশ করা তথ্যে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, দেশে প্রতিবছর ১২ হাজারের বেশি কৃষক আত্মঘাতী হন। ২০১৩ সাল থেকে এমনই হয়ে আসছে। কেন্দ্রের দাবি, কৃষকদের আয় ও সামাজিক সুরক্ষা বৃদ্ধির জন্য নানা ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও এই ঘটনা হচ্ছে। ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে বলে সরকারের আইনজীবী সর্বোচ্চ আদালতকে জানিয়েছেন। একটি এনজিওর পক্ষে কৃষকদের দুরবস্থা নিয়ে সর্বোচ্চ আদালতে মামলার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রের এই বক্তব্য। যদিও মামলাকারীদের পক্ষে আইনজীবীর দাবি ছিল, প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনায় সুবিধা ২০ শতাংশ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের কাছে পৌঁছোয় না। সর্বোচ্চ আদালত এইসব বিষয়ে কেন্দ্রকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়। গতবছরের সমস্যা যে নতুন বছরেও খুব একটা মেটেনি, একের পর এক রাজ্যে কৃষকদের আত্মহত্যা, বিক্ষোভ ইত্যাদি তার প্রমাণ। বিজেপি শাসিত মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ সহ এই রাজ্যেও কৃষক, বিশেষত আলুচাষিরা খুবই সংকটে আছেন। সম্প্রতি রাজ্যের শস্যভাণ্ডার হিসাবে পরিচিত বর্ধমানের মশাগ্রামে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের ওপর দুর্গত আলুচাষিরা রাশিকৃত আলু পুড়িয়েছেন। একে তাঁরা যন্ত্রণার উৎসব বলে মন্তব্য করেন। চতুর্দিকে রকমারি উৎসবের মাঝে তাঁদের এই যন্ত্রণার উৎসব কেন তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁরা। রাজ্যের হিমঘরগুলিতে এখনও পড়ে আছে রাশিকৃত আলু। শীতের বাজারে অগ্নিমূল্য অন্যান্য সবজি। একমাত্র সস্তায় বিকোচ্ছে আলু। কৃষক সংগঠনগুলির দাবি, বাজারে নয়–দশ কিলো আলু বিক্রি হলেও কৃষকরা পঞ্চাশ পয়সা, এক টাকার বেশি প্রতি কিলোর দাম পাচ্ছেন না, যা নিয়ে বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের আলুচাষিরা রাজধানী লখনউর পথে বিপুল পরিমাণ আলু ফেলে বিক্ষোভ দেখান। ওখানেও আলু উৎপাদন ভালো হলেও কৃষকরা ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। বছরভর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসলের দাম না পেলে কৃষকদের মানসিক অবস্থা কী হয় তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু কেন এই পরিস্থিতি তা কেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির খতিয়ে দেখা আবশ্যক। প্রতিবারই যদি এমন পরিস্থিতি হয়, তবে কৃষকরা যাবেন কোথায় ? কার কাছে বিচার পাবেন ? শুধু তো আলু নয়, মহারাষ্ট্রের আখ, গুজরাটের তুলো, সর্বত্রই কৃষকরা এখন বিপন্ন। বাজারে চিনির দাম এখনও কিলো প্রতি ৪০ টাকার বেশি। অথচ এবার দেশে রেকর্ড পরিমাণ আখ উৎপন্ন হয়েছে। যা থেকে চিনি উৎপাদন হলে দাম অনেক কম হওয়ার কথা। অন্যদিকে, কৃষকরা উৎপাদিত আখের দাম পাবেন না। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রক কৃষক কল্যাণে অনেক প্রকল্প নেওয়ার কথা প্রচার করে। যদিও সার, বিদ্যুৎ, সেচের জলের দাম ঊর্ধ্বমুখী বলে কৃষকদের অভিযোগ। ব্যাংক থেকে নেওয়া ঋণ শোধ করতে না পেরে বহু কৃষক আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। বহু ক্ষেত্রে সরকার এর নেপথ্যে অন্য কারণ খোঁজার চেষ্টা করে। দেশে বিদেশি বিনিয়োগের দরজা খোলা হচ্ছে, অথচ দেশের মাটি, তার সন্তানদের রক্ষা করার কাজ কতটুকু হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রকৃত জনমুখী সরকার দেশবাসীর সমস্যা খতিয়ে দেখে প্রতিকার করবে, এটিই কাম্য। দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারে গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি শিক্ষিতদের কর্মসংস্থানও প্রয়োজন। অথচ দেশব্যাপী শুধুই কর্মহীনতার হাহাকার। পরিস্থিতি ক্রমেই দুর্বিষহ হয়ে উঠছে। আলু পুড়িয়ে এই রাজ্যের কৃষকরা পথচলতি জনতাকে তা দিয়েছেন, এর থেকে দুঃখ, যন্ত্রণা আর কী হতে পারে। আশা করা যায়, সরকার তাঁদের সমস্যা উপলব্ধি করবে, প্রতিকারের ব্যবস্থা নেবে।

## অমৃতধারা



অনেকের মুখেই ক্ষমা নামক পরম ধর্মের গুণকীর্তন শুনতে পাওয়া যায়। কেউ সেকথা বুঝে বলেন, কেউবা বলেন না–বুঝে। কিন্তু অক্ষমের ক্ষমা ক্ষমাই নয় এবং আমরা এতকাল ধরে যত প্রকারের ক্ষমা যত অবস্থায় করে এসেছি, তার অধিকাংশই কাপুরুষতা। নারীর সতীত্বে হস্তক্ষেপকারীকে ক্ষমা করতে যে উপদেশ দেয়, সেই ব্যক্তিও ক্ষমার অযোগ্য। এইসব ক্ষেত্রে আমরা হিংসা–অহিংসার তাত্ত্বিক গবেষণায় সময় নষ্ট করব না, করা উচিত নয়। হিংসা ভালো কি অহিংসা ভালো, সেই কথার বিচার অন্য ক্ষেত্রে হবে। সতীত্ব হচ্ছে আমাদের সভ্যতার বুনিয়াদ। এই বুনিয়াদের উপরে যে হাত দিতে আসবে, তার সম্পর্কে হিংসা বা অহিংসার বিচার নাই। যেভাবে পারি, তাকে ধ্বংস করব, যেভাবে পারি সতীর চক্ষের অশ্রু মুছাব। ভীম যে দুঃশাসনের রক্ত পান করেছিলেন, অনেকেই এটাকে অতীব বীভৎস ব্যাপার বলে মনে করেন। কিন্তু দ্রৌপদীর অপমানের কথা স্মরণ করলে আমার মনে হয় যে, শুধু রক্ত পানে যথেষ্ট হয় নাই, দুঃশাসনের মাংস কেটে কেটে চর্বণ করাও মন্দ হত না। অবশ্য, যুদ্ধক্ষেত্রে ভীমসেনের তত অবসর ছিল না। রাবণ যে সবংশে নির্বংশ হল, এজন্য কারও প্রাণে বেদনা হয় না, হতে পারে না। সতীত্ব–নাশকারীর প্রতি ক্ষমা, তার কুকার্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তাকারীদের প্রতি ক্ষমা অসম্ভব। এ ক্ষমা পশুতে করতে পারে, মানুষে পারে না, পারা উচিত নয়। এরূপ ব্যাপারেও যে ক্ষমা করতে পারে, সে মানুষ নামের অযোগ্য। সতীর লাঞ্ছনাকে যারা অন্তরের গুপ্ত সহানুভূতি নিয়ে নীরবে দূর থেকে দর্শন করে, সতীর নির্যাতনে যারা– যে কোনো কারণেই হোক–আনন্দিত হয়, তারাও মানবসমাজের শত্রু।

**–শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব।**

## শব্দরঙ্গ ■ ১৮৯৫

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | ১ | | ২ | ★ | ৩ | ৪ | ★ |
| ★ | | ★ | ৫ | | ★ | | ★ |
| ★ | | ★ | | ★ | ৬ | | ৭ |
| ★ | ৮ | | | ★ | ★ | ★ | |
| ৯ | ★ | ★ | ★ | ১০ | | ১১ | ★ |
| ১২ | ১৩ | | ★ | | ★ | | ★ |
| ★ | | ★ | ১৪ | | ★ | | ★ |
| ★ | ১৫ | | ★ | ১৬ | | | ★ |

**পাশাপাশি ঃ** ১। বিস্ময়কর সাফল্য, অভাবনীয় কৃতিত্ব, অবাক কাণ্ড ৩। শঠ, সেয়ানা, বারবার দণ্ডিত ৫। বোতাম বিশেষ, ছোটো ঘণ্টা ৬। খাজনা শব্দের রূপভেদ ৮। ব্যাখ্যা সংবলিত, টাকা বা ভাষ্যযুক্ত ১০। সেইদিন, ততদিন ১২। জোয়ান, নিন্দার্থে বোকা, অপরিণতবুদ্ধি ১৪। নয় সংখ্যা বা নতুন ১৫। লাঠি, ভরসা বা অবলম্বন ১৬। কথা, কথা বলার বিশেষ ভঙ্গি, মুদ্রাদোষ।

**উপর–নীচ ঃ** ১। কাব্যপাঠের ফলে পাঠকের মনে সঞ্চারিত আনন্দের অনুভূতি ২। যা সহজেই হজম হয়, সহজপাচ্য ৪। গিরির কন্যা, পার্বতী ৭। সাপ, পুরাণে উল্লেখিত এক জাতি ৯। ভারতের পূর্বপ্রান্তের পাহাড়ি উপজাতি, নগ্ন ১০। সাধনশক্তি, তপস্যার তেজ বা প্রভাব ১১। হাঙ্গর ১৩। পৃথিবী, জগৎ বা ভূমণ্ডল।

### সমাধান ■ ১৮৯৪

**পাশাপাশি ঃ** ১। কবিরা ৩। কবেকার ৪। মন্দুরা ৫। লিপিকর ৭। নরি ১০। রমা ১২। মারফত ১৪। ভাণ্ডড় ১৫। টইটই ১৬। কসুর।

**উপর–নীচ ঃ** ১। কবিগান ২। রামদা ৩। করালিনী ৬। কট্টর ৮। রিডার ৯। জাতভাই ১১। মান্যবর ১৩। চড়ক।

# রাজনীতিতে রজনী-ব্র্যান্ডের অস্তিত্ব গুরুত্ব কাড়বে

**অমিতাভ বচ্চন বা মিঠুন চক্রবর্তীর মতো মেগাস্টাররা রাজনীতির হালে পানি পাননি। থালাইভার পক্ষেও দুর্নীতির পাঁকে ন্যায়ের পদ্ম ফোটানো কি সম্ভব হবে? বিশ্লেষণ করেছেন চিরঞ্জীব রায়।**



অমর হয়ে আছে তাঁর অজস্রসংলাপই। তার মধ্যে একটা আজ খুব মনে পড়ছে। 'কাবালি' (২০১৬) সিনেমায় খলনায়কদের নাকানিচোবানি খাইয়ে তিনি স্বভাবসিদ্ধ 'কাউকে পরোয়া করি না' কেতায় ঘোষণা করছেন, নান ভানথুতেনু সোল্লু। থিরুম্বি ভানতুথেনু, ২৫ ভারুশাথেকু মুন্নাডি এপ্পাডি পোনারো কাবালি। আপ্পাডিয়ে থিরুম্বি ভানথুতান্নু সোলু (ওদের জানিয়ে দাও, আমি ফিরে এসেছি)। ২৫ বছর আগে যা ছিলাম, আজও তেমনই আছি। এ যেন রাজনীতির মঞ্চে চড়ে ভারতের সবথেকে আলোচিত এক ব্যক্তিত্বের প্রতিপক্ষের প্রতি সদর্প ঘোষণা।

ঠিক ২৫ বছরই পিছিয়ে যাচ্ছি। ১৯৯২ সালের সুন্দর সকাল। খ্যাতির, জনপ্রিয়তার মাঝ আকাশে গনগন করতে থাকা রজনীকান্ত চেন্নাইয়ের অভিজাত পোয়েশ গার্ডেন এলাকায় তামিলনাড়ুর তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার প্রতিবেশী। বাড়ি থেকে গাড়ি চড়ে বের হওয়ার পরেই এক পুলিশ কর্তা গাড়ি আটকে দিলেন। বলা হল, মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় পেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত নিশ্চল অপেক্ষা করতে হবে। পাক্কা আধঘণ্টা। তামিলদের উপদেবতা সে শুনে স্টারসুলভ আস্ফালন দূরস্থ, ঈশ্বরের মতোই অবিচল। গাড়ি থেকে নেমে ধীরপায়ে পাশের এক গুমটিতে গেলেন। সিগারেট কিনলেন। ব্যস্ত ড. রাধাকৃষ্ণণ রোডের ধারের ল্যাম্পপোস্টে পাক্কা রজনীকান্ত স্টাইলে হেলান দিয়ে সিগারেট ধরালেন। মুহূর্তে সমুদ্রের মতো ভিড়ের ঢেউ তাকে ঘিরে আছড়ে পড়ল। থালাইভাকে থামাতে গিয়ে পুলিশ কর্তাদের তখন সাপের ছুঁচো গেলা অবস্থা। এ লোকটাকে না দাঁড় করালেই হত!

ফিরেছেন। তিনি ফিরেছেন। ২৫ বছর পরে, ঠিক কাবালি–র সংলাপে যেমনটা বলেছিলেন। হতে পারে একমাথা টাক নিয়ে, পাকা দাড়ি নিয়ে, কিন্তু আরও উত্তাল জনপ্রিয়তার স্রোতে সওয়ার হয়ে, জয়ললিতার শূন্য করে যাওয়া তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক মঞ্চে, হাজারও জল্পনার আর আশা–আকাঙ্ক্ষার জোয়ার তুলে।

যেমনটা তিনি আগেই ঘোষণা করেছিলেন, ২০১৭ সালের অন্তিম দিনটিতে চেন্নাইয়ের রাঘবেন্দ্র মণ্ডপম–এ বহু প্রতীক্ষিত ঘোষণাটি করলেন ৬৭ বছর বয়স্ক এক জীবন্ত কিংবদন্তি। গীতার শ্লোক স্মরণ করে বললেন, কর্তব্য করে যাওয়াটাই শেষকথা। বাকিটা ঈশ্বর স্থির করবেন। ভালো করো, ভালো বলো, তাহলেই ভালো হবে। আর, এটাই বর্তমান মুহূর্তের (পড়ুন, ভারতীয় রাজনীতির) একমাত্র চাহিদা। অতএব, তার দলে কোনো ক্যাডার থাকবে না। থাকবে কেবল শুভবুদ্ধিতে সজাগ সমাজের প্রহরী। তাঁর দল গড়ে উঠবে, কাজ করবে সত্য, কঠোর শ্রম এবং উন্নয়নের ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে। জাতি–রং–পেশা নির্বিশেষে সমাজের সমস্ত স্তরকে পাশে নিয়ে তামিলনাড়ুর টালমাটাল রাজনীতিতে স্থায়িত্ব আনাই হবে যে দলের লক্ষ্য।

জয়ললিতার মৃত্যুর পরে তামিল রাজনৈতিক জগতে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে ঠিকই। শশীকলা রাজ্য–রাজনীতির চালচিত্রে আপাতত প্রায় নিশ্চিহ্নই বলা চলে। ক্ষমতাসীন এডিএমকে–র মুখ্যমন্ত্রী পনিরসেলভাম জয়ললিতার রাজনৈতিক মেধা বা জনপ্রিয়তার কাছাকাছিও অর্জন করতে পারবেন বলে তাঁর এক নম্বর ভক্তটিও স্বপ্ন দেখে না। প্রধান বিরোধী দল দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘামের স্তম্ভ ৯৩ বছর বয়স্ক মুথুভেল করুণানিধি রাজনৈতিক বানপ্রস্থের দোরগোড়ায়। তাঁর পুত্র স্তালিন কিংবদন্তিস্বরূপ পিতার পোশাকে মানাচ্ছেন না।

এমন পরিস্থিতিতে তামিলনাড়ুবাসী করুণানিধি বা জয়ললিতার মতো অতি–মানবীয় মাপের এক নেতা চাইলে থালাইভার থেকে ভালো বিকল্প নেই। দক্ষিণি প্রদেশটির বাসিন্দারা তাদের নেতার মধ্যে বরাবরই স্রেফ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছাপিয়ে ঝলমলে এক ব্যক্তিত্ব খুঁজেছে। এমন এক উপস্থিতি যায় জনপ্রিয়তায় প্রভা মিটিং, মিছিল, ভোট, বিধানসভা, মন্ত্রীসভা ছাড়িয়ে দৈনন্দিন জনমানস আলোকিত করবে। রাজ্যের দুই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিএন আন্নাদুরাই এবং এম করুণানিধি নায়ক না হলেও সিনেমায় চিত্রনাট্য লিখিয়ে হিসেবে যথেষ্ট পরিচিতি পেয়েছিলেন। এমজি রামচন্দ্রনও রুপোলি পর্দার অতি জনপ্রিয় নায়ক থেকে মুখ্যমন্ত্রীতে রূপান্তরিত হন। আর, স্থান–কাল–পাত্র নির্বিশেষে 'আম্মা' বলে পরিগণিত জয়ললিতার জনপ্রিয়তা সিনেমা হলের বাইরেও নিছক ইতিহাস।

ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং জনপ্রিয়তার নিরিখে উপরোক্ত সকলকে যোজনক্রোশ পিছনে ফেলেছেন রজনীকান্ত। ঈশ্বরের মতোই তাঁর নাম উচ্চারিত হয়। তিনি থালাইভা। স্রেফ অগুনতি হিট সিনেমার অতি–মানবীয় নায়ক নন। চোখা চোখা সংলাপে আর অ্যাকশনে দর্শককে আড়াই ঘণ্টা বিনোদন বিলিয়ে তার দায়ভার শেষ হয় না। বরং, মানুষ রজনীকান্তের যাত্রা শুরু হয় ঠিক তারপর থেকে। কেমন সে যাত্রা? আমজনতার ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকতে চাওয়া এবং নিজেদের ঈশ্বর ভেবে বসা তথাকথিত ফিল্‌মি হিরোদের মতো নয়, রজনী–যাত্রা নিখাদ এক মানুষের মতো। সামান্য এক বাস কনডাক্টর থেকে ব্যক্তিপূজার নিরিখে মেগাস্টারদেরও ঈর্ষার ব্যক্তিটি তার বিশাল আয়ের অর্ধেকটাই খরচ করেন জনসেবায়।

অতি সাধারণ জীবনযাপন করেন। বিমানে ইকনমি ক্লাসে চড়েন। হোটেলে সুইটে থাকেন না। বিলাসবহুল গাড়ি চড়েন না। রোজকার জীবনে ধুতি আর ফতুয়া পরেই তাঁর দিন কাটে। সিনেমার সেটের বাইরে মাথাভরতি টাক বা চামড়ার কালো রং মেকআপে ঢাকার থোড়াই পরোয়া করেন।

তাঁর সিনেমা না চললে ফ্লপের দায় নিজে নিয়ে প্রযোজকের ক্ষতিপূরণ করে দেওয়ার সৎসাহস রাখেন। সুপারস্টারসুলভ ঠুনকো আত্মশ্লাঘা না দেখিয়ে ঠিক সময়ে শুটিংয়ে যান এবং নামি সহ–অভিনেতা থেকে স্পট বয়ের সঙ্গে সমান মর্যাদা ও আন্তরিকতায় মেশেন। তামিলনাড়ুর বন্যাত্রাণ হোক বা নিছক এক যুবকের উচ্চশিক্ষা —পর্যাপ্ত সাহায্য নিয়ে তিনি পাশে দাঁড়ান এবং সেই কারণেই কোনো বচ্চন বা খান নয়, রজনীকান্তের মন্দির তৈরি হয়।

এমন এক ব্যক্তিত্বকে ভালোবাসা যেতে পারে, কারণ খুঁটে নিয়ে ঘৃণাও করা যেতে পারে, কিন্তু রাজনীতির জগতে রজনী–ব্র্যান্ডের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যাবে না। অদ্বিতীয় মানবতাবাদ, 'আমি তোমাদেরই লোক'–সুলভ সোজা–সরল ভাবমূর্তি, আর তার সঙ্গে অতি–মানবিক এক ফিল্‌মি হিরোর উপাদানে যে ব্যক্তিত্বটি তৈরি হবে সে রাতারাতি তামিলনাড়ুর গদি দখল করে বসতে না পারুক, ভাগ্যনিয়ন্তার কাজ বেশ করতে পারবে। রাজনীতির ময়দানে এমন এক মহরথীর পদক্ষেপ তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে হিল্লোল তুলবেই। সে আন্দোলনের রেশ অবশ্যম্ভাবীভাবে ছড়িয়ে পড়বে জাতীয় রাজনীতিতেই এবং পড়ছেও। ইতিমধ্যেই। রজনীকান্ত রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার ঘোষণার দীর্ঘ সাত মাস আগেই এক টেলিভিশন চ্যানেলে বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি তথা গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি অতি উৎসাহী মন্তব্য করে বসেছিলেন, 'ওঁকে রাজনীতিতে স্বাগত। আমার অনুরোধ, রজনীকান্ত যেন বিজেপিতে যোগ দেওয়ার কথা ভাবেন, সেক্ষেত্রে আমাদের দল ওঁর জন্য উপযুক্ত পদের কথা ভাববে।' 'উপযুক্ত' পদটা অবশ্য কী মন্ত্রীমশাই সেটা ভেঙে বলেননি। বিজেপির বর্তমান সভাপতি অমিত শা–ও কাছাকাছি শব্দে গড়কড়ির রজনী–আমন্ত্রণের পুনরাবৃত্তি করেছেন এবং এটা বেশ আন্দাজ করা যায়, রজনীকান্ত এবং তার রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা ছাড়াই, বা কোনো সদর্থক ইঙ্গিত না পেয়েই বিজেপির হেভিওয়েট নেতারা উদ্‌বাহু হয়ে আমন্ত্রণ করছেন।

> রাজনীতির জগতে রজনী–ব্র্যান্ডের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যাবে না। অদ্বিতীয় মানবতাবাদ, সরল ভাবমূর্তি, আর তার সঙ্গে অতি মানবিক এক ফিল্‌মি হিরোর উপাদানে যে ব্যক্তিত্ব তৈরি সে রাতারাতি তামিলনাড়ুর গদি দখল করে বসতে না পারুক, ভাগ্যনিয়ন্তার কাজ বেশ করতে পারবে।

অমিতাভ বচ্চন 'হাম' সিনেমার সহ–অভিনেতাকে তাঁর সিদ্ধান্তের বাবদে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। কমল হাসান তো রাজনীতির মঞ্চে 'ভ্রাতা'র আগমনে মহা খুশি। উচ্ছ্বসিত রজনীকান্তের ভক্তরাও, যাঁরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, দুর্নীতির পাঁকে স্বচ্ছ, সুশাসনের পদ্ম ফোটাতে একমাত্র থালাইভাই পারেন। ঠিক যেমনটা তিনি অবলীলায় করে থাকেন পর্দায়।

ছিদ্রান্বেষীরা গায়েব, এমনটা নয় অবশ্য। যেমন, বরাবরই উলটো সুর গেয়ে প্রচারে থাকতে চাওয়া সুব্রহ্মণিয়াম স্বামী। তিনি হুল বেঁধাচ্ছেন, অশিক্ষিত রজনীকান্ত আবার আমাদের কী শেখাবেন? এই চলচ্চিত্র তারকাদের হাত থেকে মুক্তি না পেলে তামিলনাড়ুর উন্নতি সম্ভব নয়। আমি তো সর্বদাই রজনীকান্তের বিরোধিতা করে যাব।

আরও বহু প্রসঙ্গের মতো রজনী–অধ্যায়েও স্বামীর প্রচার–কাঙাল মন্তব্য ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কিন্তু, এক রাজনীতিকের ভবিষ্যৎ ব্যর্থতা বা সাফল্যের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে হলে জনগণ নামের কষ্টিপাথরটিকে ধর্তব্যের মধ্যে আনতেই হবে এবং ফিল্‌ম জগতের থেকে রাজনীতির বক্স অফিস অনেক বেশি নির্মম। সেখানে অমিতাভ বচ্চন, মিঠুন চক্রবর্তীর মতো জনপ্রিয়তার শিখরের বাসিন্দারাও হালে পানি পান না।

ফিল্‌মি–রজনীকান্ত দেশ–কাল–জাতিভেদে সকলের থালাইভা হতেই পারেন। সেখানে তার বিরোধী কেবল কুচক্রী ভিলেনরা, যাদের তিনি অনায়াসেই নাকানিচোবানি খাওয়ান। আর, রাজনীতির চক্রব্যূহে সময় ও পরিস্থিতি বিশেষে সকলেই বিরোধী। যে ভক্ত আজ মন্দিরে তাঁর বিগ্রহ বসাচ্ছে, স্রেফ রাজনৈতিক রংয়ের বিচার করে কাল সে–ই অনায়াসে সঙ্গ ছাড়তে পারে। তা ছাড়া বর্তমান ভারত তথা প্রায় সরা বিশ্বে রাজনীতি ইজ ইকুয়াল টু দুর্নীতি, কলঙ্কের দুর্গন্ধ, সাধারণ মানুষের ঘৃণার, অনীহার বিষয়বস্তু।

রজনীকান্ত স্বচ্ছ–সরল থাকলেও যাদের পাশে নিয়ে তাকে দিন–প্রতিদিন চলতে হবে সেইসব রাজনীতিকের চারিত্রিক দৃঢ়তা আতশিকাচের সামনে পড়তেই পারে এবং পড়বেও। তখন আর হিরো থালাইভার মতো বুক ঠুকে নেতা রজনী বলতে পারবেন না, 'এন ভাঝি, থানি ভাঝি। আমার রাস্তা আমিই তৈরি করে নিই।' রাজনীতি মানে অন্যায়ের সমঝোতা, অন্যায়ের সঙ্গে সমঝোতা মানে রজনীকান্তের ভাবমূর্তির অন্ত্যেষ্টি।

# ধর্মকে মধ্যযুগের অন্ধকূপ থেকে আলোয় আনলেন স্বামীজি

**মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব প্রথম থেকেই বর্তমান তার বিকাশই ধর্ম। বুঝিয়েছিলেন স্বামীজি, লিখেছেন ঋষারানি ব্যানার্জি।**



বিবেকানন্দের হাত ধরেই হিন্দুধর্ম প্রকৃত আধুনিক রূপ লাভ করেছিল। হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি, আচার সর্বস্বতা সম্পর্কে মানুষের প্রচলিত যে বিশ্বাস তা প্রথম অপসৃত হয়েছিল তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিতে। আমেরিকায় শিকাগো বিশ্বধর্মসম্মেলনে প্রথমদিনের বক্তৃতার পরই তিনি হয়ে উঠেছিলেন ধর্মমহাসভার কেন্দ্রীয় চরিত্র। আশ্চর্যের বিষয় একটা বিশ্বধর্মসম্মেলন হল– হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম, খ্রিস্টান, তাও, শিন্টো, পারসিক, কনফুসিয়াস–এত ধর্মের সমাগম হল কিন্তু ধর্মের আসল অর্থ কী তা কেউ বোঝাতে পারলেন না। সবাই নিজের ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করতেই ব্যস্ত। যেন কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শক্তির আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা। বিবেকানন্দ দেখালেন ধর্ম মানে কী ? আর জানালেন হিন্দুধর্ম কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে না, চিরন্তন মানবধর্মের উপাসনা করে। ধর্ম বলতে স্বামীজি বুঝেছিলেন–'মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব প্রথম থেকেই বর্তমান, তার বিকাশই ধর্ম।' স্বামীজি কেন্দ্রীয় স্থানে রাখলেন 'মানুষ'–কে, আলাদা করে ঈশ্বরের কথা বললেন না, মানুষের মধ্যেই তা প্রকাশিত হয় বললেন। এক মুহূর্তে যেন ধর্মকে মধ্যযুগের অন্ধকূপ থেকে তুলে এনে আলোয় প্রকাশিত করলেন। শাস্ত্রপাঠ, ধর্মীয় আলোচনা, যুক্তি–বিচার, আচার–অনুষ্ঠান তাঁর দৃষ্টিতে ছিল 'ধর্মের গৌণ অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ মাত্র।'

যে বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মের (হিন্দুধর্ম) গোঁড়ামি ও আচার সর্বস্বতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলনরূপে গড়ে উঠেছিল তাকে তিনি প্রকাশ করলেন হিন্দুধর্মের পরমমিত্ররূপে। তিনি বললেন, 'বৌদ্ধধর্ম হিন্দু ধর্মেরই পরিপূরক। বৌদ্ধধর্মকে বাদ দিয়ে হিন্দুধর্ম বাঁচতে পারে না, আবার বৌদ্ধধর্মও হিন্দুধর্মকে বাদ দিয়ে বাঁচতে পারে না।' স্বামীজির মতে ভারতবর্ষের প্রয়োজন ছিল বৌদ্ধধর্মের হৃদয়বত্তার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মের ধীশক্তির সম্মিলন।

হিন্দুদের মূর্তিপূজার তাৎপর্যও তিনি বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে মূর্তিপুজো কোনো কুসংস্কার নয়–মূর্তিগুলি আসলে প্রতীক। যেমন খ্রিস্টধর্মে ক্রুশ এক পবিত্র প্রতীক, তেমনি হিন্দুধর্মে সর্বশক্তিমান ভগবানের বিভিন্ন প্রতীক বিভিন্ন মূর্তি।

বিবেকানন্দই শিখিয়েছিলেন হিন্দুধর্মকে ভালোবাসতে হলে, তাকে অন্যান্য ধর্মের সমকক্ষ বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করতে হলে সমস্ত ধর্মকে আগে শ্রদ্ধা করতে হবে। মস্তিষ্ক আর হৃদয়ের সমন্বয়েই মানুষ পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে। বিবেকানন্দ হৃদয় দিয়ে হিন্দুধর্মকে অনুভব করেছিলেন। তাই বিশ্বধর্মসম্মেলনে সবাই যখন নিজধর্ম প্রচারে ব্যস্ত তখন তিনি নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের জয়গান করলেন না। বললেন, 'আমি সেই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে গৌরব বোধ করি, যে ধর্ম জগৎকে শিখিয়েছে সহিষ্ণুতা ও সর্বজনীন গ্রহীতার আদর্শ। আমরা শুধু সব ধর্মকে সহ্যই করি না, সব ধর্মকেই আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি।'

প্রকৃতি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রূপে মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়, তাই বিভিন্ন মতাদর্শ তৈরি হয়েছে। কিন্তু সব মতাদর্শের সত্যই এক। এই বাস্তব সত্যটি তিনি খুব সহজেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁর ব্যাখ্যাও ছিল স্বতন্ত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' দর্শন সার্থকরূপে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর চিন্তাধারায়। হিন্দুধর্ম যেন মৃতপ্রায় অবস্থা থেকে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর স্পর্শে। বিশ্বধর্মসম্মেলনে হিন্দুধর্ম ছিল যেন এক গর্বিতা রমণী যার জৌলুস, আকর্ষণ দেখতে আগ্রহী ছিল সকলে। বহু উৎসাহী দৃষ্টির সামনে সে যেন প্রশংসায় স্নান করছিল। বহু মানুষকে বিশ্বাস, ভরসা ফিরিয়ে, আশ্বাস দিয়েছিল তার ব্যাখ্যা। বৈদিক ঋষির মতো উপস্থিত শ্রোতাদের তিনি 'অমৃতের পুত্র' বলে সম্বোধন করলেন। বললেন, 'হিন্দুরা তোমাদের পাপী বলতে চায় না। তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের তোমরা অধিকারী, পূর্ণ ও পবিত্র। এই জগতে তোমরাই দেবতা। পাপী ? মানুষকে পাপী বলাই তো মহাপাপ, মনুষ্য প্রকৃতির উপর এ এক স্থায়ী কলঙ্ক'। তাঁর এই ব্যাখ্যা ছিল সে সময় মানুষের কাছে অভিনব। পূর্বজন্মের কর্মফল, নিয়তিবাদ সবকিছু যেন অসার প্রমাণিত হল তাঁর মানবতাবাদের জয়গানের কাছে।

## জনমত

### স্বামীজির সমন্বয়ের বাণী আজ বেশি প্রাসঙ্গিক

স্বামীজির জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের সমারোহের সময় রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল বলেছিলেন, ষাট বছর আগে স্বামীজির সমন্বয়ের বাণীর যত না প্রয়োজন ছিল, তার চেয়ে আজ এই সংকটপূর্ণ সময়ে তার প্রয়োজন অনেক বেশি। বহুধা বিভক্ত এই সমাজে স্বামীজির মৈত্রী, সর্বজনীনতা, সর্বজনগ্রাহ্যতা, সহিষ্ণুতার দর্শন আজ আরও বেশি প্রয়োজন। স্বামীজি দেশের কাজের জন্য একশোটি যুবক প্রার্থনা করেছিলেন। স্বামীজির মানসপুত্র নেতাজির মধ্যে ভারতবর্ষ সেই 'একাই একশো'–যুবককে উপহার পেয়ে ধন্য হয়েছিল। ভারতের জাতীয় জীবনে অনেক নেতাই জনমনের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার্জন করেছেন কিন্তু একান্তরূপে সবাইকে বিমুগ্ধ করেছেন দুজন মহামানব। যুবসমাজের প্রকৃত নেতা স্বামীজি ও নেতাজি, এই দুই যুগ পুরুষের জীবন ও বাণী আমাদের এই ভোগবাদী ও স্বার্থপরতামগ্ন জীবনে নতুন আশার সঞ্চার করে। যুবসমাজকে তাদের জীবন ও বাণীর চর্চা উদ্দীপনার সঙ্গে সঙ্গে সঠিক পথ দেখায়। বর্তমান যুবসমাজ যদি এই দুই ব্যক্তিত্বকে জীবনের ধ্রুবতারা করে তবে কোনোভাবেই ভুলপথে তাদেরকে কেউ নিতে পারবে না। নেতাজি ও স্বামীজির বাণী ও রচনা কেবলমাত্র শব্দছটা নয়, শুধুই কথার কথা নয়, পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের আধার নয়–জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজ–এর সর্ব ধর্মের সেনারা সম্মিলিত রক্তের অবিচ্ছন্ন প্রবাহে অখণ্ড ভারতের জাতীয় জীবনের ঐতিহ্যকে অমর রেখেছেন।

পরমতসহিষ্ণুতা এই দেশের অস্থিমজ্জায় মিশে আছে। 'যত মত তত পথ'–শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই অমোঘ বাণী সারা বিশ্বের সমন্বয়ের মূল বুনিয়াদ। বিবেকানন্দের মত হল– 'পূর্বাপেক্ষা উদার ভিত্তিতে ধর্মের অনুশীলন আবশ্যক। সর্বপ্রকার সংকীর্ণ, অনুদার ও বিবদমান ধর্মভাব দূর করিতে হইবে।'

**সত্যজিৎ চক্রবর্তী, বিবেকানন্দপাড়া, ধূপগুড়ি।**

## ঘুঁটে পোড়ে, গোবর বিন্দাস

**উত্তরায়ণ দেব**

'দে দে প্যার দে–প্যার দে–প্যার দে রে হামে প্যার দে !' যদিও ভালোবাসা চাওয়া, তবুও ওই আল্লাকে নামপে কুছ দে দে বাবা'র মতো শোনাচ্ছে না কিছুটা! আসলে দুর্মূল্য এই সোহাগী বস্তুটির বাজার মূল্য, যারা পায় না তারা জানে। আর যে না চাইতে দিয়ে পালটা অবহেলা পায় সে চোখের জলে এর মর্ম বোঝে। আচ্ছা কাউকে মাথায় রিভলভার ঠেকিয়ে যদি বলা হয়, বল আই লাভ ইউ!' প্রাণের ভয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় আক্রান্ত মানুষটা হয়তো বলে দেবে, 'আ–আই–লা–লভ–ই–ইউ!' ব্যাস সেই মুহূর্তে সেই সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা জন্ম নেবে তাই না ! আর যদি তা না হয়, তাহলে দুইহান কথা আস্যে।

ভালোবাসা বস্তুটির কিছু আত্মীয়–পরিজন আছে। এরা হল শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান, স্নেহ, মমতা, সমবেদনা ও আরও অনেকে। এদের বাহ্যিক কোনো অস্তিত্ব নেই, বসবাস একই ঠিকানায়। সেই ঠিকানা হল–'মন' অ্যাপার্টমেন্ট, কেয়ার অফ মনুষ্যত্ব, ১ নং চেতনা সরণি, ভব সাগর। হারাধনের দশটি ছেলের মতো এরাও একে একে হারিয়ে গেছে ও যাচ্ছে। আর এদের না পেয়ে সবচেয়ে বেশি দুঃখী, সমাজের প্রবীণ মানুষেরা।

মালিক বা প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা আন্দোলন করা যায়, ন্যায্য পাওনা আদায়ের অধিকারে। কিন্তু যদি কোনো আন্দোলন সংঘটিত হয় সম্মান বা স্নেহ পাওয়ার দাবিতে! কেমন যেন সব ওলট–পালট হয়ে যায়। সম্প্রতি এমনই একটি দুঃখজনক আন্দোলনের অঙ্কুর দেখা দিয়েছে। ছাপা খবরে দেখা গেল 'সন্তান স্নেহ ফিরে পাওয়ার দাবি আদায়ে নামছেন 'ব্রাত্য' প্রবীণরা'! হায়রে বিধাতা, এই খবরটাও দেখা বাকি ছিল! সন্তান স্নেহ আদায়ে, সংঘটিত হচ্ছে 'ব্রাত্য' প্রবীণদের 'ফোরাম'। সমাধান হবে এভাবে ? এভাবে কি সমাধান হয় ? মা তার সন্তান প্রতিপালন করবে, কোন আইনে লেখা আছে ? সেই

**প্যাঁচফোড়ন**

দায়িত্বটা আসে মা–বাবার অন্তর থেকে। এক্ষেত্রে দায়িত্ব শব্দটাও বড়োই বেমানান। মানুষ জন্মায় না, উপযুক্ত পরিবেশে মানুষ হয়ে ওঠে। সেই মনুষ্যত্বই যদি লোপ পায়, মানবিকতা যদি শেষ হয়ে যায়, সেখানে আইন পারবে তা সুনিশ্চিত করতে বা ফিরিয়ে আনতে ? আইন দিয়ে মনুষ্যত্বের জন্ম দেওয়া যায় ? আইন কতদিন পারবে আগলে রাখতে ?

'গিভ অ্যান্ড টেক পলিসি!' এই নিয়ম কাঁদুনে বাচ্চার তুলনায় হাস্যমুখর সন্তানই মায়ের চুমু বেশি পায়। কারণ সেখানে সুখের দেওয়া–নেওয়া হয়। পরীক্ষায় ভালো ফল করে পরিজনের সম্মান বা আনন্দ বাড়ালেই পড়ুয়ার ভাগ্যে উপহার জোটে। অর্ধাঙ্গ/অর্ধাঙ্গিনি শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের খাতির করলে বিনিময়ে তার বাপের বাড়ির লোকেরাও সমাদর পায়। একদিকে একটু ভাটা পড়লেই উলটোদিকে নানান অজুহাত শুরু। আসলে সংসারে দেওয়া ফুরিয়ে গেলে পাওয়াটাও ফুরিয়ে যায়। সেই নিয়মেই যখন আর মালকড়ি নেই বোঝা হয়ে যায়, তখন জীবন সায়াহ্নে এসে পৌঁছানো মা–বাবারও বোঝা হয়ে ওঠে। তার ওপর সেই যুগলের একজন যখন জীবনের নাট্যমঞ্চ থেকে প্রস্থান করে যায়, তখন অন্যজনের 'একা' বেঁচে থাকাটা কঠিন হয়ে পড়ে। নিজেরই সংসারে অপাঙ্‌ক্তেয়, আপনজনের গলগ্রহ হয়ে বেঁচে থাকাটা বিভীষিকা। চোখ মেলে তাকালে এমন দুঃখজনক নমুনা চারপাশে অসংখ্য দেখা যাবে। এই 'নরক' থেকে একটি পথ যায় বৃদ্ধাশ্রমের দিকে। ভেবে দেখতেই পারেন। ভাগ্য আপনা থেকে জন্ম নেয় না, তাকে গড়ি আমরাই।

আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন থাকলে, সন্তানের ভরসায় না থেকে প্রবীণদের জন্য সরকারি বিভিন্ন সুযোগসুবিধা জেনে নিতে তৎপর হয়ে উঠুন। আসলে এই সময়ে পৌঁছে অর্থের চেয়েও সময় দানের সঙ্গী দুর্লভ হয়ে ওঠে। তাই একাকীত্ব কাটাতে সঙ্গী খুঁজে নিন। চলতে–ফিরতে আপনি সক্ষম হলে, বাড়ি বয়ে গিয়ে আপনারই মতো সমবয়সি কাউকে সময় দিন। এতে আপনার একাকীত্বও অনেকটাই কাটবে। একেই তো সমব্যথী বলে, তাই না! জীবন আপনার, অতএব তুল্যমূল্য বিচারে কী করবেন তা আপনার সিদ্ধান্ত। ধুঁকে ধুঁকে আদালতের দরজায় ঘুরে বেড়াবেন সন্তানের 'দয়া' আদায়ের জন্য, নাকি মানসিক প্রস্তুতি নেবেন সংসার–আশ্রমের শেষে, জীবনের শেষ আশ্রম, বৃদ্ধাশ্রমে থাকবার। সেই অনুযায়ী মানসিক প্রস্তুতি নেওয়াটাই শ্রেয়। এই ঘটনার 'ব্যতিক্রম' আশা জাগাতে পারে, কিন্তু তা কখনও উদাহরণ হতে পারে না। সব অধিকার, বিবাদের শেষে আখেরে ভালো থাকাটা ভীষণ দরকার। যেখানেই থাকুন, যেভাবেই থাকুন, ভালো থাকুন!